

তাক্বদীরঃ আল্লাহর এক গোপন রহস্য

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তাক্বদীর বিষয়ে বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার

তাক্বদীর কেন্দ্রিক প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি

আমাদের সমাজে কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি প্রচলিত আছে, যেগুলি তাক্বদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী। এসব ভুল-ভ্রান্তি মানুষ কখনও কথায়, কখনও কাজে আবার কখনও বিশ্বাসে করে থাকে। তাক্বদীর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলাতে আমরা এ জাতীয় ২/১টি ভুল-ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছি। নীচে প্রচলিত আরো এরূপ কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরা হলঃ

১. তাক্বদীর বিরোধী কথাবার্তা বলাঃ যেমনঃ বিপদাপদ এলে কেউ কেউ তাক্বদীরকে মেনে না নিতে পেরে বলে, হে আল্লাহ! আমি কি করেছি? অথবা বলে, আমি এমন ফলাফলের যোগ্য নই! অনুরূপভাবে কেউ কেউ কারো বিপদ এলে তার উদ্দেশ্যে বলে, বেচারার এমন বিপদ হল, অথচ সে এমন মুছীবতের যোগ্য নয়; তাক্বদীর তার প্রতি অবিচার করেছে!

এসব তাক্বদীর বিরোধী কথাবার্তা। সবকিছুতে যে আল্লাহর হিকমত রয়েছে, সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা থাকার কারণেই সে এমন কথাবার্তা বলে। কেননা আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে যা নিয়েছেন বা তাকে যা দিয়েছেন, সবইতো একমাত্র তাঁরই। তাঁর প্রত্যেকটি কর্মে রয়েছে হিকমত এবং রহস্য, যা বান্দা জানে না। অতএব, এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার বর্জন করতে হবে।[1]

২. মুছীবত এলে ‘যদি’ শব্দ ব্যবহার করাঃ সম্পদ নষ্ট, শস্য-ফসলের ক্ষতি, সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত হলে অথবা অন্য যে কোন বিপদাপদ এলে চিন্তিত, রাগান্বিত ও বিরক্ত হয়ে অনেকেই বলে, যদি আমি এমন করতাম, তাহলে এমনটি হত না অথবা, আমি যদি এমন করতাম, তাহলে এমন হত! আমি যদি সফর না করতাম, তাহলে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতাম!

এ ধরনের বাক্য ব্যবহার মারাত্মক ভুল এবং ব্যক্তির অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ মুছীবতে বান্দাকে ধৈর্যধারণ এবং তওবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার করলে বান্দার আফসোস এবং দুশ্চিন্তা বাড়ি ছাড়ি কমে না। তাছাড়া এতে তাক্বদীরের বিরোধিতার ভয়তো থেকেই যায়।[2]

সেকারণেই আল্লাহ মুনাফিকদেরকে ভৎসনা করে তাদের এ ধরনের বাক্য তুলে ধরে বলেন,

﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [سورة آل عمران: 154]

‘আমাদের যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না’ (আলে ইমরান ১৫৪)।

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [سورة آل عمران: 168]

‘তারা হলো ঐসব লোক, যারা (যুদ্ধে না যেয়ে) বসে থাকে এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না’ (আলে ইমরান ১৬৮)। আল্লাহ তাদের এ জাতীয় কথার জবাব দিয়েছেন এভাবে,

﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة آل عمران: 168]

‘তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’ (আলে ইমরান ১৬৮)।

আমরা কোন কিছু অর্জনের যথারীতি প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও যদি তা অর্জন করতে না পারি, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত নীতিমালা মেনে চলতে হবে। তিনি বলেছেন, এমতাবস্থায় তোমাদের কেউ যেন না বলে, ‘আমি যদি এমন এমন করতাম’। বরং সে যেন বলে,

«فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»

‘এটিই আল্লাহ নির্ধারিত তাক্বদীর এবং তিনি যা চেয়েছেন, তা-ই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়’।[3]

হাদীছটিতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হল যে, কোন কিছু ঘটে যাওয়ার পরে ‘যদি’ কোন ফায়দা দেয় না। সুতরাং তাক্বদীরের উপর খুশী থাকতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিদানের প্রত্যাশী হতে হবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে আরো ভাল কিছু অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।[4]

তবে বিপদাপদ ছাড়াই কল্যাণকর কোন কিছুর আশা করে ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ আল্লাহ যদি আমাকে ধন-সম্পদ দিতেন, তাহলে তাঁর পথে অনেক ব্যয় করতাম। গতকাল যদি আমি ক্লাসে যেতাম, তাহলে অনেক উপকৃত হতাম।[5]

৩. তাক্বদীর বিরোধী কার্যকলাপ করাঃ যেমন: বিপদাপদ এলে সহ্য করতে না পেরে কাপড় ছেড়া, চুল ছেড়া, বুক চাপড়ানো, গালে আঘাত করা, বিলাপ করা, বদ দো‘আ করা, ধ্বংস কামনা করা ইত্যাদি। এগুলি সবই জাহেলী এবং তাক্বদীর বিরোধী কর্মকাণ্ড।[6]

৪. মৃত্যু কামনা করাঃ অনেকেই বালা-মুছীবতে ধৈর্যধারণ না করতে পেরে নিজের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু এটি মস্ত বড় ভুল, কোন মুমিনের জন্য মৃত্যু কামনা করা বৈধ নয়। তবে কেউ যদি মৃত্যু কামনা করেই, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশিত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কামনা করতে হবে[7]:

«اللَّهُمَّ أَحْبَبْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»

‘হে আল্লাহ! আমাকে আপনি ঐসময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন, যে পর্যন্ত আমার জন্য আমার যিন্দেগী কল্যাণকর হয়। আর আপনি আমাকে ঐ সময়ে মৃত্যু দান করুন, যখন মারা গেলে মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়’।[8]

আল্লামা আব্দুর রহমান সা‘দী[৯] (রহেমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, অসুস্থতা, দরিদ্রতা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি বিপদাপদে মৃত্যু কামনা করতে হাদীছটিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এরূপ মৃত্যু কামনার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষতি রয়েছে। তন্মধ্যে:

ক. বিপদাপদে বান্দাকে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে; কিন্তু মৃত্যু কামনা করে সে এই নির্দেশের খেলাফ করে।

খ. এমন মৃত্যু কামনা মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। তাকে অলস ও নিস্তেজ করে ফেলে এবং তার হৃদয়ে হতাশার অনুপ্রবেশ ঘটায়।

গ. মৃত্যু কামনা করা চরম বোকামী এবং অজ্ঞতা। কারণ সে জানে না যে, মৃত্যুর পরে তার কি হবে। হতে পারে, যে সমস্যা থেকে সে মুক্তি পেতে চাইছে, মৃত্যুর পরে তাকে তার চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে

ইত্যাদি।[10]

৫. আত্মহত্যা করাঃ কেউ কেউ বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদিতে জর্জরিত হয়ে জীবনের প্রতি ত্রুদ্ব হয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার জন্য আত্মহত্যার মত জঘন্য পথ বেছে নেয়। কিন্তু এটি তাক্বদীর এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ বিরোধী। মহান আল্লাহ এমন জঘন্য কর্মকে হারাম করেছেন এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [سورة النساء: 29-30]

‘আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন এবং যুলমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে অচিরেই আমরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। আর ইহা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য’ (নিসা ২৯-৩০)। ভেবে দেখুন, দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে নিষ্কৃতির আশায় কোন মর্মস্তুদ শাস্তির দিকে সে পা বাড়ায়! [11]

৬. কন্যা সন্তান জন্ম নিলে নারায় হওয়াঃ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় মানুষ জাহেলী যুগের অজ্ঞ মানুষদের মত আচরণ করে। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে মুখ কালো করে ফেলে। মেডিকেল-ক্লিনিকে গেলে আপনি এমন ভূরি ভূরি দৃশ্য দেখতে পাবেন। ছেলে হলে ডাক্তার-নার্সরাও খুব খুশী হয়ে খবরটি পরিবেশন করেন; কিন্তু মেয়ে হলে ব্যাপারটি ঘটে সম্পূর্ণ উল্টা। এটি সম্পূর্ণ তাক্বদীর বিরোধী এবং জাহেলী আচরণ। মহান আল্লাহ জাহেলী যুগের এহেন আচরণের নিন্দা করে বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [سورة النحل: 58-59]

‘যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে সে (বাঁচিয়ে) রাখবে নাকি তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। জেনে রেখো, তাদের সিদ্ধান্ত খুবই নিকৃষ্ট’ (নাহল ৫৮-৫৯)। [12] এর আরো কিছু ক্ষতির দিক রয়েছে। যেমন:

ক. এমন আচরণের অর্থ হল, আল্লাহর উপটৌকন ফেরৎ দেওয়া; অথচ উচিৎ ছিল সাদরে এই উপহার গ্রহণ করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এই একটি পয়েন্টই যথেষ্ট।

খ. এমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারী জাতির মান-সম্মানে আঘাত করা হয়।

গ. এমন আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের অজ্ঞতা, মূর্খতা, বোকামি এবং স্বল্প বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়।

ঘ. এতে জাহেলী যুগের মানুষদের আচরণের সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টিতো রয়েছেই। [13]

মানুষ জানেনা, কিসে তার জন্য অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাছাড়া মেয়েরাই হচ্ছে মা, বোন, স্ত্রী এবং তারাই সমাজের অর্ধেক। আর বাকী অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ, কিন্তু তাদেরকে গর্ভে ধারণ করে মেয়েরাই। ফলে পুরো সমাজটাই যেন মেয়েদের সমাজ।

তাদের মর্যাদা বর্ণনায় কুরআন এবং হাদীছে অনেক বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [سورة الشورى: 49]

‘তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র উপহার দেন’ (শূরা ৪৯)। এখানে আল্লাহ মেয়েদেরকে পুরুষদের আগে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়কে উপহার হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

‘যাকে কয়েকটি কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, ঐ ব্যক্তির জন্য তার কন্যারা জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হয়’।[14]

৭. হিংসা করাঃ হিংসা একটি দূরারোগ্য ব্যাধি। খুব কম মানুষই এথেকে বেঁচে থাকতে পারে। সেজন্য বলা হয়,

لَا يَخْلُقُ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ، وَالْكَرِيمَ يُخْفِيهِ

‘কেউই হিংসা মুক্ত নয়। তবে হীন মনের মানুষ তা প্রকাশ করে; কিন্তু মহৎ ব্যক্তি তা গোপন রাখে।[15] হিংসুক কর্তৃক হিংসিত ব্যক্তির কল্যাণকর কোন কিছু পতন কামনা অথবা হিংসুক কর্তৃক হিংসিত ব্যক্তির কল্যাণকর কোন কিছু প্রাপ্তিকে অপছন্দ করার নাম হিংসা।

হিংসা তাক্বদীর বিরোধী জঘন্য আচরণ। কেননা হিংসুক আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। সে যেন বলতে চায়, অমুক যোগ্য নয়, তদুপরি তাকে দেওয়া হল! অমুক পাবার যোগ্য, অথচ তাকে মাহরুম করা হল! ভাবখানা এরূপ যে, হিংসুক তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে আল্লাহকে পরামর্শ দিচ্ছে! সে এমন আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর ফায়ছালার দুর্নাম করে!

অতএব সর্বপ্রকার হিংসা বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সবকিছুতে প্রভূত কল্যাণ এবং হিকমত রয়েছে।[16]

৮. আল্লাহর উপর কসম করাঃ যেমন: কেউ কারো সম্পর্কে বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। আমাদের সমাজে এমনটি অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ভাল মানুষ কর্তৃকও কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে। ধরা যাক, কেউ কাউকে ভাল কাজের দাওয়াত দিল, কিন্তু সে তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পাপকাজে নিমজ্জিত থাকল। এমতাবস্থায় এই দাঙ্গি নিরাশ হয়ে তাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দেয়; বরং হয়তোবা তার উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহর কসম! কস্মিনকালেও আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না।

মনে রাখতে হবে, এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার খুবই ভয়াবহ। ইহা একদিকে যেমন আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ, অন্যদিকে তেমনি তাক্বদীর বিরোধী। কেননা হেদায়াত আল্লাহর হাতে। তাছাড়া মানুষের শেষ ভাল হবে কি মন্দ হবে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। এমন বাক্য ব্যবহারকারীকে কে বলেছে যে, আল্লাহ ঐ পাপীকে ক্ষমা করবেন না? আল্লাহর রহমত আটকানোর অপচেষ্টা করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে?!

হাদীছে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكُمْ»

‘এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, আমার উপর কসম করে কে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? (সে জেনে রাখুক!) আমি অমুককে ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু

তোমার আমল নষ্ট করে দিয়েছি'।[17]

ফুটনোট

[1]. আল-ঈমান বিল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৫২।

[2]. সুলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ, তায়সীরুল আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ, তাহক্বীক: উসামা উতায়বী, (রিয়াজ: দারুছ ছুমায়ঈ, প্রথম প্রকাশ: ২০০৭ ইং), ২/১১৬০; আব্দুর রহমান ইবনে নাছের সা'দী, আল-ক্বওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, তাহক্বীক: ছবরী ইবনে সালামাহ, (রিয়াজ: দারুছ ছাবাত, প্রথম প্রকাশ: ২০০৪ ইং), পৃ: ২৬৮-২৬৯।

[3]. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪, 'তাক্বদীর' অধ্যায়, 'দৃঢ় হওয়া, অপারগতাকে বর্জন করা, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হওয়া এবং তাক্বদীরের বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া' অনুচ্ছেদ।

[4]. মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ উছায়মীন, আল-ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, (দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওয়ী, তা. বি.), ২/৩৬১-৩৬২; আল-ঈমান বিল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৫২-১৫৩

[5]. আল-ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, ২/৩৬২-৩৬৩।

[6]. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছবেরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকেরীন, (ত্বনত্বা: দারুছ ছাহাবাহ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০ ইং), পৃ: ৬৯।

[7]. আল-ঈমান বিল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৫৫।

[8]. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৮০, 'দোআ এবং যিকর' অধ্যায়, 'বিপদাপদে মৃত্যু কামনা করা নিন্দনীয়' অনুচ্ছেদ।

[9]. শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাছের ইবনে আব্দুল্লাহ সা'দী সউদী আরবের প্রবীণ এবং বিজ্ঞ আলেমগণের একজন। ১২ই মুহাররম ১৩০৭ হিজরীতে সউদী আরবের আল-ক্বাছীম অঞ্চলের উনায়যা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হেফয সম্পন্ন করেন এবং ২৩ বছর বয়সে শিক্ষক হিসাবে পাঠদান শুরু করেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আমীন শানক্বীত্বী (১২৮৯-১৩৫১ইং)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ উছায়মীন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র। 'আল-ক্বওলুল মুফীদ ফী মাক্বাছিদিত তাওহীদ', 'তাক্বদীরুল কারীমিল মান্নান', 'ফাতাওয়া সা'দিয়াহ সহ ৩৫টিরও বেশী মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। ১৩৭৬ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নছীব করুন (শায়খ সা'দী প্রণীত 'মানহাজুস সালেকীন ওয়া তাওযীহুল ফিক্বহি ফিদ্ব দ্বীন'-এর শুরুতে মুহাক্কিক আশরাফ ইবনে আব্দুল মাক্বছূদ তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন (রিয়াজ: আযওয়াউস সালাফ, প্রথম প্রকাশ: ২০০০ইং), পৃ: ৭-১৫)।

[10]. আব্দুর রহমান ইবনে নাছের সা'দী, বাহজাতু কুলুবিলা আবরার ওয়া কুররাতু উয়ুনিল আখইয়ার ফী শারহি জাওয়ামি'ইল আখবার/১৯৪-১৯৫, হা/৭৭, (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরেফ, তৃতীয় প্রকাশ: ১৯৮৪ ইং)।

[11]. আল-ঈমান বিল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৫৬-১৫৭।

[12]. জাসেম দাওসারী, ছওনুল মাকরুমাত বিরি'আয়াতিল বানাত, (কুয়েত: মাকতাবাতু দারিল আকছা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬ ইং), পৃ: ১৬।

[13]. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ ফী আহকামিল মাওলূদ, তাহক্কীক: সালীম ইবনে ঈদ হেলালী সালাফী, (দাম্মাম: দারু ইবনিল ক্বাইয়িম এবং জীযাহ: দারু ইবনে আফফান, প্রথম প্রকাশ: ১৪২১ হি:), পৃ: ৪৯-৫০।

[14]. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৫, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সন্তানের প্রতি দয়া করা, তাদেরকে চুমু খাওয়া এবং তাদের সাথে আলিঙ্গন করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৯, 'সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'কণ্যা সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

[15]. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ১০/১২৪-১২৫।

[16]. আল-ঈমান বিল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৫৪-১৫৫।

[17]. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২১, 'সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15059>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন